ENSEMBLE
A bi-lingual peer reviewed academic journal

ISSN 2582-0427 (Online)
Volume 2, Number 1
March, 2020
http://www.ensembledrms.in

https://doi.org/10.37948/ensemble-2020-0201-a001

Crossref

ত্রিপুরায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যচর্চা ও রবীন্দ্রনাথ

(MODERN BENGALI LITERARY PURSUIT IN TRIPURA & TAGORE)

Rintu Das [1]✉

প্রবন্ধ নির্দেশক সংখ্যাঃ
২০০২০৬৬৬ এন ১ টি এন ডি এস

প্রবন্ধ সংক্রান্ত নথিঃ
জমা – ৬ই ফেব্রুয়ারি ২০২০
গ্রহণ – ১৪ই মার্চ ২০২০
বৈদ্যুতিন প্রকাশ – ২০ই মার্চ ২০২০

সূচকশব্দঃ
আধুনিক বাংলা সাহিত্য, 'কিশোর সাহিত্য সমাজ', ত্রিপুরা, 'রবি', রবীন্দ্রনাথ

সারসংক্ষেপঃ
ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে ত্রিপুরার রাজপরিবারের সম্পর্ক দেবেন্দ্রনাথের সময় থেকে। সেই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও রাজপরিবারের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সেই সম্পর্ক ক্রমশ দৃঢ় হয় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের মাধ্যমে। বাংলা ভাষা ত্রিপুরায় রাজভাষার মর্যাদা লাভ করেছে। রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত সাহিত্য ও পুরাণাদির বাংলায় অনুবাদ হয়েছে। বাংলায় সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রেও রাজারা উৎসাহ প্রদান করেছেন। ত্রিপুরায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যের চর্চা অনেক পরে মূলত রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে 'কিশোর সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠা ও পরে 'রবি' পত্রিকার মাধ্যমে ত্রিপুরার বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার সূচনা হয়। 'রবি' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনা প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সূচনা ও বিস্তার কীভাবে হয়েছে তার স্বরূপ সন্ধানই এই গবেষণা নিবন্ধের মূল অন্বিষ্ট।

ত্রিপুরায় রাজন্য আমলে বাংলা ভাষা রাজভাষার স্বীকৃতি লাভ করেছিল। ত্রিপুরার অনেক প্রাচীন তাম্রলিপি ও সিলমোহরে বাংলা ভাষার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। বহু পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন ও দলিল দস্তাবেজ থেকে আমরা ত্রিপুরায় রাজকার্যে বাংলা ভাষা ব্যবহারের প্রমাণ পাই। রাজভাষা যদি বাংলা হয় তাহলে সেই ভাষায় সাহিত্যচর্চা হবে এটাই স্বাভাবিক। ত্রিপুরাতেও রাজপৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য রচনা ও অনুবাদের কাজ হয়েছিল বাংলা ভাষায়। ত্রিপুরায় বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন 'রাজমালা'। 'রাজমালা' মূলত ত্রিপুরার রাজাদের ইতিহাস। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ধর্মমাণিক্য 'রাজমালা' বাংলা পয়ার ছন্দে রচনা করিয়েছিলেন। 'রাজমালা' পদ্যে লেখা হলেও ত্রিপুরার রাজাদের ইতিহাস 'রাজাবলী' গদ্যে লেখা হয়েছিল। যদিও 'রাজাবলী' গ্রন্থটি দুষ্প্রাপ্য।

[1] [First Author] ✉ [Corresponding Author] Assistant Professor, Department of Bengali, Tripura University (A Central University), Tripura, INDIA; Email: **rintudas@tripurauniv.in**

This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License

ত্রিপুরায় বাংলা সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে আধুনিকতার সূত্রপাত হয় মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের হাত ধরে। এই বীরচন্দ্র মাণিক্য হলেন সেই ব্যক্তি যিনি সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভাকে স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'ভগ্নহৃদয়' কাব্য পড়ে তিনি রবীন্দ্রনাথকে উৎসাহিত করেছিলেন। ত্রিপুরা থেকেই তাঁকে 'ভারত ভাস্কর' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে বীরচন্দ্র মাণিক্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে জানিয়েছেন,

> "ভগ্নহৃদয় নামে ইহা ছাপানো হইয়াছিল, তখন মনে হইয়াছিল লেখাটা খুব ভালো হইয়াছে। লেখকের পক্ষে এরূপ মনে হওয়া অসামান্য নহে। কিন্তু তখনকার পাঠকদের কাছেও এ লেখাটা সম্পূর্ণ অনাদৃত হয়নাই। মনে আছে এই লেখা বাহির হইবার কিছুকাল পরে কলিকাতায় ত্রিপুরার স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের মন্ত্রী আমার সহিত দেখা করিতে আসেন। কাব্যটি মহারাজের ভালো লাগিয়াছে এবং কবির সাহিত্যসাধনার সফলতা সম্বন্ধে তিনি উচ্চ আশা পোষণ করেন, কেবল এই কথাটি জানাইবার জন্যই তিনি তাঁহার অমাত্যকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।"[১]

শুধু রবীন্দ্রনাথ নন, ঠাকুর বাড়ির সঙ্গে ত্রিপুরার রাজাদের সম্পর্ক পূর্ব থেকেই ছিল। পরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই সম্পর্ক আরো প্রগাঢ় হয়। বীরচন্দ্র মাণিক্য, রাধা কিশোর মাণিক্য, বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য ও বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য এই চার রাজার সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ ছিল। বিভিন্ন সময়ে রাজাদের সুপরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন রবীন্দ্রনাথ। ব্যক্তিগত ও রাজকার্য ক্ষেত্রে নানা সংকটে রাজারা রবীন্দ্রনাথের দ্বারস্থ হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রাজাদের আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথের ত্রিপুরা আগমন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অবসর যাপন হলেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও কর্মকাণ্ডেরও সাক্ষী থেকেছেন। জগদীশচন্দ্র বসুর বিলেত যাত্রা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ আর্থিক সাহায্য চেয়েছিলেন রাজার কাছে। শুধু এই ক্ষেত্রে নয়, বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও রাজারা তাঁকে আর্থিক সাহায্য করেছিলেন।

বীরচন্দ্র মাণিক্য রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের গুণগ্রাহী ছিলেন। বীরচন্দ্র মাণিক্য নিজেও কবিতা ও গান রচনা করতেন। বীরচন্দ্রের বিখ্যাত হোলির গানগুলি আজও মানুষের মুখে মুখে ফেরে।এই বীরচন্দ্রের আমলেই ত্রিপুরায় মূলত আধুনিক বাংলা সাহিত্যচর্চার সূচনা হচ্ছে বলা যেতে পারে। ত্রিপুরায় সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ ছিল 'কিশোর সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠা। রবীন্দ্রনাথ রাধাকিশোর মাণিক্যের আমন্ত্রণে ত্রিপুরায় আসেন ১৩১২ বঙ্গাব্দে। রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরা সাহিত্য সম্মিলনী সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভার উদ্বোধনে রবীন্দ্রনাথ 'দেশীয় রাজ্য' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। সেদিন থেকেই ত্রিপুরায় একটি স্থায়ী সাহিত্য প্রতিষ্ঠান গড়ার চেষ্টা চলতে থাকে। পরবর্তীকালে মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের অনুপ্রেরণায় ত্রিপুরায় 'কিশোর সাহিত্য সামাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। 'রবীন্দ্র জীবনী'তে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে,

> "রবীন্দ্রনাথ বহুকাল হইতে স্থানিক সাহিত্য-পরিষদ্ স্থাপনের কথা সুপারিশ করিয়া আসিতেছিলেন, এখন পর্যন্ত তাহা কোথাও কার্যে পরিণত হয় নাই; ত্রিপুরাই অগ্রসর হইয়া এই কার্যে নামিল ও রবীন্দ্রনাথকেই উহার আদর্শ পুরোহিত-জ্ঞানে সভা অলংকৃত করিবার জন্য আহ্বান করিল। কবি আগরতলায় উপস্থিত হইলে মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য ত্রিপুরা সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতিরূপে কবিকে বরণ করিলেন (১৭ই আষাঢ় ১৩১২)।"[২]

ত্রিপুরা থেকে সেই সময় 'বঙ্গভাষা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হতো। এর প্রথম প্রকাশ ছিল ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ। সম্পাদক ছিলেন সুরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা। এছাড়া 'অরুণ' ও 'ধূমকেতু' নামে দুটি সাপ্তাহিকও ছিল। 'অরুণ'-এর সম্পাদক ছিলেন চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ এবং 'ধুমকেতু'র সম্পাদক ছিলেন মহেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা। এর

পরবর্তীকালে বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের সময় 'কিশোর সাহিত্য সমাজ' নামে একটি সাহিত্যসভা স্থাপিত হয়। এই কিশোর সাহিত্য সমাজ থেকেই 'রবি' নামে ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

১৩৩২ বঙ্গাব্দের ১০ফাল্গুন ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মার আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ শেষবার আগরতলায় আসেন। 'কিশোর সাহিত্য সমাজে'র পক্ষ থেকে তাঁকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। দীনেশ চন্দ্র চৌধুরী রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করে একটি 'আগমন গীতি' লিখেছিলেন। আগমন গীতিটি এইরূপ,

কোন পাখিটি এলো ফিরে
(আজ) বসন্তকালে।
আজও সে তার সুরের খেয়াল
খেলে হৃদয় তালে।
আজ যে তাহার কণ্ঠ শুনে
পুলক জাগে মনের কোণে
কোন অতিথি এলো জানি
কাহার পুণ্য ফলে।
কি দিয়ে আজ করবো পূজা ?
(হবে) গঙ্গাপূজা-গঙ্গাজলে।[৩]

'কিশোর সাহিত্য সমাজ' আয়োজিত এই সভায় ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মা সভাপতি হিসেবে ভাষণ দেন। সেই ভাষণে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা বলে রবীন্দ্রনাথের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে শেষে সভার উদ্দ্যেশে বলেন,

> "আজ আপনারা সেই রবীন্দ্রনাথকেই সম্বর্ধনা করিতে সমবেত; আর সেই সভার নেতৃত্ব করিবার ভার আমার প্রতি অর্পিত হইয়াছে। আমি এ বিষয়ে মূক। কারণ আমি এমন কোনো ভাষা পাইনা, যে আপনাদিগকে আমার অন্তরের আনন্দকে প্রকাশ করিতে পারি। কবিবরের আশীর্বাদ আকাঙ্ক্ষা করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি। তিনি আমাদের এই 'কিশোর সাহিত্য সমাজ'কে আশীর্বাদ করুন এই কামনা।"[৪]

'কিশোর সাহিত্য সমাজে'র পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথকে যে অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয়েছিল তার শুরুতে রবীন্দ্রনাথকে সম্বোধন করা হয়েছিল এইভাবে,

"কবি সম্রাট- শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের শ্রী শ্রী করকমলে।
দেব, তুমি বাংলার কবি-ভারতের কবি-বিশ্ব কবি। তোমায় নমস্কার।"[৫]

'কিশোর সাহিত্য সমাজ'-এর সহ-সভাপতি শীতল চন্দ্র চক্রবর্তী 'রবীন্দ্র প্রশস্তি' পাঠ করেছিলেন। সেই প্রশস্তির সূচনায় রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে বলা হয়েছিল- "বিশ্বব্যাপী যশঃ কিরণ কিরীটিন" (রবি, ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৩৫ ত্রিপুরাব্দ)

'কিশোর সাহিত্য সমাজে'র অভিনন্দনের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যে বক্তব্য রেখেছিলেন তা 'কবি সম্রাটের বাণী' নামে 'রবি' পত্রিকার ২য় বর্ষের ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। বাল্যকালে কবিতা রচনার সূচনালগ্ন থেকে ত্রিপুরার সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন। কবি হিসেবে তাঁর পরিচিতি যখন শুধুমাত্র আত্মীয়-পরিজনদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তখন ত্রিপুরার রাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর রাধারমন ঘোষকে দূত হিসেবে পাঠিয়েছিলেন তাঁকে কবি হিসেবে অভিনন্দিত করার ইচ্ছা জানাতে। এরপর 'রাজর্ষি' লেখার সময় 'রাজমালা' থেকে তথ্য পাঠানো, কার্সিয়াং যাত্রায় সঙ্গী হওয়া প্রভৃতি নানা প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। বীরচন্দ্রের মৃত্যুর পর

রাধাকিশোর মাণিক্যের সঙ্গেও তাঁর সুসম্পর্ক বজায় ছিল। বালক ব্রজেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে তাঁর পত্র বিনিময় হতো। বাংলা ভাষা ত্রিপুরায় শুধু মাতৃভাষা নয় রাজ-ভাষার সম্মান পেয়েছে। এই ভাষা ও সাহিত্যের সূত্র ধরে রাজপরিবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যে আরো দৃঢ়তর হয়েছে সে কথাও উল্লেখ করেন রবীন্দ্রনাথ। বক্তব্যের শেষে 'কিশোর সাহিত্য সমাজ' ও ত্রিপুরার জনসাধারণের উদ্দেশে তিনি বলেন,

> "আমি যশোভাগ্যবান কবির মত এখানে মান নিতে আসিনি, আমি স্বর্গগতঃ মহারাজাদের বন্ধুরূপে যেমন আমার তরুণ বয়সে এখানে প্রীতি ও শ্রদ্ধা লাভ করেছি, আজ আমার শেষ বয়সেও সেই আত্মীয়তার শেষ রসটুকু ভোগ করে বলে যেতে এসেছি- সর্বস্তরতু দুর্গানি সর্বোভদ্রানি পশ্যতু।"[৬]

এই 'কিশোর সাহিত্য সমাজ'-এর সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মুখপত্র ছিল ত্রৈমাসিক 'রবি' পত্রিকা। 'রবি' পত্রিকার নামকরণ নিয়ে 'কিশোর সাহিত্য সমাজ'-এর সভায় সদস্যদের মতামত নেওয়া হয়েছিল। অধিক সংখ্যক সদস্যের মতকে প্রাধান্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত পত্রিকার নাম স্থির করা হয়। 'নন্দিনী' পত্রিকার ৩য় বর্ষের ২য় সংখ্যায়[৭] এই নামকরণ সংক্রান্ত যে বিস্তারিত তথ্য আছে তা তুলে ধরা যেতে পারে।

যে সদস্যরা তাঁদের নামের পাশে পত্রিকার নাম প্রস্তাব করেছেন তাঁরা হলেন—

- মহারাজ কুমার নরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা— রবি, বিভূতি
- মথুরানাথ দাস— যযাতি, ত্রিপুর
- ভূপাল চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়— ত্রিপুর
- বিনোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায়— সবিতা
- যোগেশ চন্দ্র দত্ত— ত্রিপুরা সুন্দরী
- শরৎচন্দ্র ঘোষ— ত্রিপুরা দর্পণ
- রাধাকৃষ্ণ দাস— চন্দ্র
- কমিটির দ্বারা প্রস্তাবিত— কিশোর সাহিত্য সমাজ, বঙ্গভাষা (নব পর্যায়)

উল্লিখিত ১১টি প্রস্তাবিত নাম থেকে পত্রিকার নাম কী রাখা হবে তা নির্ধারণে সভাপতির নির্দেশে উপস্থিত সদস্যদের মতামত গ্রহণ করা হয় । 'রবি' নামকরণের সমর্থক সদস্যরা ছিলেন—

- মহারাজ কুমার নরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা (প্রস্তাবক)
- মহারাজ কুমার নবদ্বীপ চন্দ্র দেববর্মা
- মহারাজ কুমার ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্মা
- মহারাজ কুমার রণবীর কিশোর দেববর্মা
- মহারাজ কুমার যতীন্দ্র মোহন দেববর্মা
- মহারাজ কুমার নরসিংহ চন্দ্র দেববর্মা
- অমিয় কুমার গুপ্ত
- রায় বাহাদুর জ্যোতিষ চন্দ্র সেন
- সতীশ চন্দ্র চক্রবর্তী
- রাধাকৃষ্ণ দাস
- হীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায়
- মণিময় মজুমদার
- যোগেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী

'ত্রিপুর' নামকরণের সমর্থক সদস্য—

- ভূপাল চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (প্রস্তাবক)
- ঠাকুর প্রতাপ চন্দ্র রায়
- ব্রজকৃষ্ণ দেববর্মা

বাকি প্রস্তাবিত নামগুলি প্রস্তাবক ছাড়া কোন সদস্য সমর্থন জানাননি। কাজেই অধিকাংশ সদস্যের মত অনুসারে 'রবি' নামই সভায় গৃহীত হয়। আশ্চর্যের বিষয় প্রস্তাবিত নামে 'ত্রিপুর' বা 'ত্রিপুরা' একাধিকবার থাকা সত্ত্বেও প্রায় একতরফা ভাবে 'রবি' নামটি সমর্থন করা হয়। এই নামকরণের সময় রবীন্দ্রনাথের নামটি যে প্রস্তাবক ও সমর্থকদের মাথায় ছিল তা বলাই বাহুল্য।

'রবি' পত্রিকার সম্পাদকের নাম স্থির করার জন্য প্রস্তাব করেন প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সভাপতি ও অধিকাংশ সদস্যের ইচ্ছানুসারে পত্রিকার সম্পাদক নির্বাচিত হন মহারাজ কুমার নরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা ও পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত বিদ্যাভূষণ। তবে 'রবি' পত্রিকার প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষ পর্যন্ত এই দুজন সম্পাদক ছিলেন। তৃতীয় বর্ষ থেকে ষষ্ঠ বর্ষ পর্যন্ত 'রবি'-র সম্পাদক হিসেবে মহারাজ কুমার নরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা একাই দায়িত্ব পালন করেছেন। 'রবি' পত্রিকার কার্যাধ্যক্ষ ছিলেন সত্যরঞ্জন বসু। এর প্রচ্ছদ রচনা করেছিলেন প্রখ্যাত শিল্পী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা। প্রথম প্রচ্ছদটি ধারাবাহিকভাবে বেশ কিছু সংখ্যায় অপরিবর্তিত ছিল। পত্রিকার শুরুতেই লেখা থাকতো "আনন্দরূপামৃতং যদ্বিভাতি"। 'রবি'-র প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় আষাঢ়, ১৩৩৪ ত্রিপুরাব্দে, ইংরেজি ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে। এই প্রথম সংখ্যার সূচনাতে সম্পাদক নরেন্দ্র কিশোর দেববর্মার 'রবি-মঙ্গল' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথের স্তুতি ও 'রবি' পত্রিকার স্তুতি সমার্থক হয়ে ধরা দিয়েছে। এরপর শীতলচন্দ্র চক্রবর্তীর 'ত্রিপুরা-ইতিহাসের মুখবন্ধ' প্রবন্ধটি স্থান পেয়েছে। ছয় বছর 'রবি' পত্রিকা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এই ছয় বছরে 'রবি' পত্রিকার ২৪টি সংখ্যায় ত্রিপুরা সংক্রান্ত ও ত্রিপুরা বহির্ভূত অসংখ্য লেখা প্রকাশিত হয়। তবে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবের বিষয় ছিল রবীন্দ্রনাথের রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশ করা। 'ভাবের ঝুলি' নাম দিয়ে মূলত রবীন্দ্রনাথের রচনাই প্রকাশ করা হতো। যদিও 'ভাবের ঝুলি'তে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের গান, কবিতা ও অন্যান্য রচনা আগে অথবা পরে 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এই রচনাগুলি রবীন্দ্র রচনাবলী, গীতবিতান, ও অন্যান্য গ্রন্থেও সংকলিত হয়েছে। তবে 'রবি'র সঙ্গে অন্যান্য পত্রিকা ও গ্রন্থে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার অনেক ক্ষেত্রেই পাঠান্তর লক্ষ করা যায়।

'রবি'তে 'সাময়িক সাহিত্য' লিখতেন কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত ও বিবিধ প্রসঙ্গ লিখতেন সত্যরঞ্জন বসু। ত্রিপুরার ইতিহাস বিশেষভাবে আলোচিত হতো 'রবি'তে। কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত তখন 'রাজমালা' সম্পাদনাতেও ব্যস্ত ছিলেন। শীতল চন্দ্র চক্রবর্তী ত্রিপুরার ইতিহাস বিষয়ে তথ্যপূর্ণ আলোচনা করতেন 'রবি' পত্রিকায়। এছাড়া ঐতিহাসিক অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধির প্রবন্ধ 'রবি'কে সমৃদ্ধ করেছিল। ত্রিপুরার জাতীয় জীবনকে তুলে ধরাও 'রবি'র একটি অন্যতম দিক ছিল। ত্রিপুরার বিভিন্ন ভাষাভাষি জনজাতির প্রচলিত রূপকথা, উপকথা, কাহিনি প্রকাশিত হতো। রাজপরিবারের দুই কুমারী গোলাপ দেবী ও নিরুপমা তাঁদের অন্দরের বৃদ্ধা সেবিকাদের কাছে গল্প শুনে সেগুলোকে প্রকাশ করতেন।

স্থানীয় মহিলা কবি অনঙ্গমোহিনী দেবীর অনেক কবিতা 'রবি'তে প্রকাশিত হয়েছিল। অজিতবন্ধু দেববর্মা, সতীশ চন্দ্র দেববর্মা, পরিমল কুমার ঘোষ, যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য, সতীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়ম্বদা দেবী প্রমুখের লেখা 'রবি'কে সমৃদ্ধ করেছিল। পরিমল কুমারের মাধ্যমে বুদ্ধদেব বসুর কবিতাও 'রবি'তে প্রকাশিত হয়। শুধু কবিতা, রূপকথা, উপকথা নয়; অনেক উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধও এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে মহারাজ কুমার নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মার 'বাংলা ভাষার চারিযুগ' প্রবন্ধটি অত্যন্ত প্রশংসার দাবি রাখে। অন্যান্য বিশিষ্ট প্রবন্ধের মধ্যে যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর 'বাংলায় কার্পাস', ডাঃ শরৎচন্দ্র দত্তের 'নিদ্রা', দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্তের 'উত্তর পশ্চিম ও কাশ্মীরে', ব্রজেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়লিখিত 'বাংলা পরিভাষা', যোগেশচন্দ্র দত্তের 'বর্ণাশ্রম ধর্ম' ভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তীর বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত নানা প্রবন্ধ 'রবি'র বিভিন্ন সংখ্যাকে ঋদ্ধ করেছিল। এছাড়াও কবি গোবিন্দ দাসের কবিতার ধারাবাহিক আলোচনা করেছিলেন হেমচন্দ্র চক্রবর্তী, 'ঋষিসঙ্গ বা ষড়দর্শন প্রবেশিকা' ধারাবাহিকভাবে লিখেছিলেন হেমন্তকুমার বসু। তাঁর 'অনন্তমূল' প্রবন্ধটিও বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। দীনেশচন্দ্র সেনের 'ময়মনসিংহ গীতাবলি'ও 'রবি'তে প্রকাশিত হয়েছিল। যোগেন্দ্রমোহন ঘোষের 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের আদি ব্যাস', বরদাচরণ চক্রবর্তীর 'সাধক জীবন' প্রভৃতি বহু প্রবন্ধ 'রবি'তে প্রকাশিত হয়।

'রবি' পত্রিকায় ছয় বছরে চব্বিশটি সংখ্যা প্রকাশের পর বন্ধ হয়ে যায়। 'রবি'র সেই স্বর্ণময় যুগের অবসান ঘটে। এর কারণ হিসেবে সত্যরঞ্জন বসু জানিয়েছেন,

> "রবি'র এই গৌরব অধ্যায়কে রক্ষা করা গেল না কেন, তাহার আলোচনায় এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, রাজদরবারে তখন হয়ত 'রবি' পরিচালনার রূপকে সহজভাবে গ্রহণ করার পক্ষে খুব বেশী সহায়ক ছিল না।"[৮]

তবে দীর্ঘ তিরিশ বছর পর পুনরায় 'রবি' পত্রিকা প্রকাশের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু 'রবি-নবপর্যায়'ও তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে পুনরায় বন্ধ হয়ে যায়। 'রবি নবপর্যায়'-এর প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় আশ্বিন ১৩৬৮ বঙ্গাব্দে। এর সম্পাদক ছিলেন ডঃ হিমাংশুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও তপনকুমার ভট্টাচার্য। এই সংখ্যাটিও সত্যরঞ্জন বসু, সুকুমার সেন, আশুতোষ ভট্টাচার্য, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমেন বসু, রাজ্যেশ্বর মিত্র, হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, নগরীমোহন পট্টনায়ক, মোহিত পুরকায়স্থ, রনেন্দ্রনাথ দেব, চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত প্রমুখ বিদগ্ধ লেখকের প্রবন্ধ এবং অন্নদাশঙ্কর রায়, অশোকবিজয় রাহা, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত প্রমুখ বিশিষ্ট কবির কবিতায় সমৃদ্ধ হয়েছিল।

ত্রিপুরার সাহিত্যচর্চার অন্যতম ধারক ও বাহক হিসেবে 'কিশোর সাহিত্য সমাজ' ও 'রবি' পত্রিকার অবদান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই 'কিশোর সাহিত্য সমাজ' গড়ে ওঠা এবং 'রবি' পত্রিকার সূচনা ও বিস্তারে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ত্রিপুরার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা হলেও ত্রিপুরায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যচর্চায় রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সম্পর্কিত আলোচনা উপেক্ষিতই থেকে গেছে। আলোচ্য প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ত্রিপুরার সাহিত্যিক যোগাযোগ গুরুত্ব পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের রচনা যেমন ত্রিপুরার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তেমনি রবীন্দ্রনাথ সংক্রান্ত অনেক প্রবন্ধ ত্রিপুরার সাহিত্যকে ঋদ্ধ করেছে। রবীন্দ্রনাথের উত্তরসূরি হিসেবে যেসব বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিকেরা ত্রিপুরার আধুনিক বাংলা সাহিত্যচর্চায় অবদান রেখেছেন তাঁদের প্রসঙ্গও এই প্রবন্ধে স্থান পেয়েছে। 'কিশোর সাহিত্য সমাজ' ও 'রবি' পত্রিকার ইতিহাস এবং সেই সূত্রে ত্রিপুরায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যচর্চায় রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে আরো সমৃদ্ধ করবে।

তথ্যসূত্র :

[১] রবীন্দ্রনাথঠাকুর, 'জীবনস্মৃতি', 'রবীন্দ্ররচনাবলী' ৯মখণ্ড, ১২৫ রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী সুলভ সংস্করণ, পৌষ, ১৪১৭, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা ১৭, পৃষ্ঠা ৪৭৭

[২] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্র জীবনী', ২য় খণ্ড, ৫ম সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ ভাদ্র, ১৪১৭, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা ১৭, পৃষ্ঠা ১৫৯

[৩] নরেন্দ্রকিশোর দেববর্মা ও কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত (সম্পাদিত) 'রবি' ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৩৫ ত্রিপুরাব্দ, আগরতলা

[৪] ঐ

[৫] ঐ

[৬] ঐ

[৭] অলক রায় বর্মণ (সম্পাদিত),'নন্দিনী', ৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, ১৮ মার্চ, ১৯৭২,আগরতলা

[৮] হিমাংশুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও তপন কুমার ভট্টাচার্য (সম্পাদিত) 'রবি' (নবপর্যায়), আশ্বিন ১৩৬৮, আগরতলা